জুম্ম সংবাদ বুলেটিন

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির অনিয়মিত মুখপত্র

বুলেটিন নং ১১, ৩য় বর্ষ, রবিবার, ২৩শে মে, ১৯৯৩

যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন ও সমস্যা সমাধানে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী

বাংলাদেশ সরকার ও জনসংহতি সমিতি কর্তৃক উভয় পক্ষের সম্মত যুদ্ধবিরতি গত ৫ই নভেম্বর হতে শুরু হয়েছে। বাহ্যতঃ উভয় পক্ষেরই সম্মতি সাপেক্ষে যুদ্ধ বিরতি গৃহীত হলেও কার্যতঃ শুরু থেকেই অসংখ্যবার যুদ্ধবিরতি লংঘিত হয়ে আসছে। এজন্য জন সংহতি সমিতি কর্তৃক সরকারের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। অপরপক্ষে বাংলাদেশ সরকারও যুদ্ধবিরতি লংঘনের দায় জন সংহতি সমিতির উপর চাপানোর যথাসাধ্য চেষ্টা আজ অবধি চালিয়ে যাচ্ছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে সমাধানের স্বার্থে উভয়পক্ষের যুদ্ধ বিরতি যেমনি অত্যন্ত জরুরী ও অপরিহার্য, তেমনি ততোধিক জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ হলো—যথাযথ ও আন্তরিকতা নিয়ে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করা। কেননা এর উপরই নির্ভর করছে সংলাপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপযুক্ত অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকা বা না থাকা এবং এর মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে সমস্যা সমাধানে কোন পক্ষের কতটুকু সদিচ্ছা রয়েছে ও তা কতটুকু আন্তরিকতাপূর্ণ। তাই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে যথাযথভাবে যুদ্ধবিরতি কার্যকরী করা বনাম লংঘন করা বর্তমানে এক স্পর্শকাতর ও বহুল আলোচিত বিষয় বলে বিবেচিত।

বলাই বাহুল্য যে উভয় পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক করার বিষয়ে সরকারের সম্মতি দানের অনেক পূর্বে এবং উভয় পক্ষের সম্মত যুদ্ধবিরতি ঘোষণার অনেক আগেই জন সংহতি সমিতি পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা শান্তিপূর্ণ ও রাজনৈতিক উপায়ে যথাশীঘ্র সম্ভব সমাধানের আন্তরিক সদিচ্ছা নিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে একতরফাভাবে তিন মাসের যুদ্ধবিরতি ঘোষণা দিয়ে এসেছিল এবং তা সঠিকভাবে কার্যকরীও করে এসেছিল। সুতরাং উভয় পক্ষের সম্মত যুদ্ধবিরতি জন সংহতি সমিতির পক্ষ থেকে লংঘন করার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না।

প্রাথমিক স্তরে জন সংহিত সমিতি কর্তৃক সূচিত একতরফা যুদ্ধবিরতির প্রেক্ষাপটেই ৫ই নভেম্বর ৯২ অনুষ্ঠিত প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠকে সরকার পক্ষ যুদ্ধবিরতির বিষয় উত্থাপন করতে ও সম্মত হতে বাধ্য হয়েছিল। তাই এটা যতটা রণ-কৌশলগত, ততটা আন্তরিক সদিচ্ছাপ্রসূত নয় বলে অনেকের ধারণা। এজন্যে বর্তমান যুদ্ধবিরতিকে কেবল "জন সংহতি সমিতির ঘোষিত যুদ্ধবিরতি" বলেও সরকার কর্তৃক সময় বিশেষে প্রচারণা চালাতে শোনা যায়। স্বভাবতঃই সরকার যুদ্ধবিরতির সুযোগকে জন সংহতি সমিতির সামরিক শক্তি দুর্বল করার কৌশলগত কাজে সদ্ব্যবহার করতে অধিকতর মনযোগী হবে বলে অনেকেরই বিশ্বাস। আজ অবধি সরকার দু'শতাধিকবার যুদ্ধবিরতি লংঘন করেছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কিংবা শান্তিবাহিনী হতাহত বা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এমন কয়েকটি উভয় পক্ষের মধ্যকার সংঘর্ষের বিশ্লেষণ করলে সরকারের ঐ কৌশলগত প্রবণতার যথার্থ প্রতিফলন ঘটবে—

সংঘর্ষের তারিখ	সংঘর্ষস্থল	সংঘর্ষস্থলের ভৌগোলিক অবস্থান (দূরত্ব)	সংঘর্ষের বিবরণ
৬/১১/৯২	পিঠাগুলাছড়া, বাঘাইছড়ি	তিনটিলা-কাচালাং রাস্তা হতে ৫ কি: মি: ভাংগুম সেনা ক্যাম্প হতে — ২ কি: মি:	শা: বা: ১জন নিহত ১জন ধৃত
২৩/১২/৯২	বর্মাছড়ি মোন, লক্ষ্মীছড়ি	মহালছড়ি-রাঙ্গামাটি রাস্তা হতে ৩ কি: মি: দিলাছড়ি ও শুকনাছড়ি রাস্তা হতে ৩ কি: মি:	শা: বা: এর আস্তানা
২/১/৯৩	ওয়াগ্গা মোন, রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি সদর হতে ৩ কি: মি: মানিকছড়ি ক্যাম্প হতে ৩ কি: মি:	আক্রমণ গুলি বিনিময়
৮/১/৯৩	দার্খাপাড়া, নানিয়ার চর	রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি রাস্তা হতে ৩ কি: মি: জরিগ্যা পাড়া ক্যাম্প হতে ৩ কি: মি:	শা: বা: ১ জন ধৃত
১৫/১/৯৩	শিলছড়া, লংগদু	লংগদু-মাইনী রাস্তা হতে ৭ কি: মি: রাঙাপানিছড়া ক্যাম্প হতে ৬ কি: মি:	শা: বা: ২ জন আহত
১৭/২/৯৩ইং	সোলাংছড়ি, রেংখাং রিজার্ভ, বিলাইছড়ি		পাবলিক ১জন নিহত
১০/৩/৯৩ইং	কাইন্দা রাঙ্গামাটি		শা: বা: ৩ জন ধৃত
১৬/৩/৯৩ইং	কলাবন্যা মোন, মহালছড়ি	মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি রাস্তা হতে ৮ কি: মি: উল্টাছড়ি ক্যাম্প হতে ৪ কি: মি:	শা: বা: ৩ জন ধৃত
১৭/৩/৯৩ইং	মধ্যছড়া, মহালছড়ি	মহালছড়ি-খাগড়াছড়ি রাস্তা হতে ১০ কি: মি: মধ্য আদাম ক্যাম্প হতে ৩ কি: মি:	শা: বা: এর আস্তানা অগ্নিসংযোগ
৩০/৩/৯৩ইং	বামের বগাছড়ি মোন, নানিয়ারচর	রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি রাস্তা হতে ৩ কি: মি: জরিগ্যাগাপাড়া ও শুকনাছড়ি ক্যাম্প হতে ৩ কি: মি	শা: বা: ১জন নিহত
১—২/৪/৯৩	জুর্বো মহাজন পাড়া মোন, নানিয়ার চর	রাঙ্গামাটি-মহালছড়ি রাস্তা হতে ৩ কি: মি: জরিগ্যাপাড়া ও শুকনাছড়ি ক্যাম্প হতে ৩ কি: মি:	হেলিকপ্টারসহযোগে শা: বা: এর আস্তানা আক্রমণ
৯/৪/৯৩ইং	ওয়াগগা মোন রাঙ্গামাটি	রাঙ্গামাটি থানা সদর থেকে ৩ কি: মি: মানিকছড়ি ক্যাম্প হতে ৩ কি: মি:	শা: বা: ২ জন নিহত
২৯/৪/৯৩ ও ৪/৫/৯৩	চিনাল ছড়া, দিঘীনালা	বাবুছড়া-জারুলছড়ি রাস্তা হতে ২ কি: মি: বাবুছড়া জোন হতে ৩ কি: মি:	সেনা ১ জন নিহত ও ৩ জন আহত

মোন : পার্বত্য চট্টগ্রামের দুর্গম বড় পাহাড়, শা: বা: — শান্তিবাহিনী

উল্লেখিত তথ্য থেকে প্রতিয়মান হয় যে- ঐসব সংঘর্ষের স্থানগুলো গভীর জঙ্গলে মোন (পাহাড়) এলাকায় অবস্থিত। ঐসব অঞ্চলের উপর দিয়ে সাধারণ বা সেনা চলাচলের কোন রাস্তাই নেই। এসব স্থান ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ গিরি-খাদ ও দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল। এমন কি বতকগুলো সংঘর্ষস্থলে স্বাভাবিক জনবসতিও নেই।

দ্বিতীয়ত : সংঘর্ষের স্থানগুলো সাধারণ বা সেনাবাহিনীর স্বাভাবিক চলাচলের ও টহলদানের সড়ক ও স্থান থেকে অনেক অনেক দূরে। এসব স্থানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী একমাত্র টার্গেট অপারেশনই পরিচালনা করে থাকে। সামরিক অভিযান ব্যতীত সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঐসব স্থানে সচরাচর যায়ই না বা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাবারও প্রশ্ন উঠে না। এক ক্যাম্পের সাথে অন্য ক্যাম্পের যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ঐসব অঞ্চল দিয়ে যাবার প্রয়োজন পড়ে না।

তৃতীয়তঃ কতকগুলো সংঘর্ষে সেনাবাহিনী সরাসরি শান্তিবাহিনীর আস্তানায় আক্রমণ হেনেছে। গোপনসূত্রে খবর পেলেই কেবল সুনির্দিষ্ট টার্গেট নিয়ে সেনাবাহিনী ঐরূপ আক্রমণ করে থাকে। সুতরাং এটা বলা যায় যে এগুলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরই স্বতঃপ্রবৃত্ত আক্রমণ। যদিও বাংলাদেশ সরকার এসব সংঘর্ষকে কখনো শান্তি বাহিনী কর্তৃক আক্রমণ, কখনো বা স্বাভাবিক সড়ক টহল দান কালে আচমকা শান্তিবাহিনীর সাথে মুখোমুখী বলে ব্যাপক অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। সেনাবাহিনী তাদের যুদ্ধ বিরতি লংঘনকে শান্তিবাহিনীদের ঘাড়ে চাপানোর লক্ষ্যে কতিপয় সংঘর্ষের পর ধৃত শান্তিবাহিনী বা স্থানীয় জুম্মদের কাছ থেকে "শান্তিবাহিনীরা আগে আক্রমণ করেছে"—এমন ধরণের বানোয়াট সম্মতি স্বাক্ষর জোর-পূর্বক আদায় করে নিতেও লক্ষ্য করা গেছে।

৪ঠা এপ্রিল সংঘটিত সংঘর্ষ বিশ্লেষণ করা যাক। ঐ সময় চিমেলছড়ার গভীর জঙ্গলে শান্তিবাহিনীর একটি মোবাইল গ্রুপ অবস্থান করছিল। সম্ভবতঃ গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সেনাবাহিনী ২৯শে মার্চ ঐ এলাকায় এক তল্লাসী অভিযান চালায় এবং উভয় পক্ষের মধ্যে কিছু গুলি বিনিময় ঘটে। ক্রমাগত কয়েকদিন পর্যন্ত ঐ অভিযান অব্যাহত থাকে। ৪ঠা এপ্রিল আবারো আক্রমণ করা হলে আত্ম রক্ষার্থে শান্তিবাহিনীরাও পাল্টা আঘাত হানতে বাধ্য হয়। আক্রান্ত হলে আত্মরক্ষার অধিকার শাশ্বত। অথচ সরকার ঐ ঘটনাকে প্রচার করলো—সড়ক টহলদানের সময় আক্রমণ। ওদিকে কোন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নেই—যা সেনা টহলের প্রয়োজন রয়েছে। একমাত্র বাবুছড়া জোন হতে জারুলছড়ি ক্যাম্পের সংযোগ—সড়ক রয়েছে। তাও টহলদানের প্রয়োজন পড়ে না এবং টহলও দেয়া হয় না। কেবল সময় বিশেষে সেনাদের খাদ্য সরবরাহ ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ঐ রাস্তা থেকেও সংঘর্ষস্থল ২ (দুই) কিঃ মিঃ ভেতরে।

সরকার কর্তৃক যুদ্ধ বিরতি লংঘনের দায় জন সংহতি সমিতির উপর চাপানোর যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার একটা ফলপ্রসূ ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের জন্য সরকার বর্তমানে দেশে-বিদেশে প্রবল জনমত চাপের মধ্যে রয়েছে। ফলশ্রুতিতে লোক দেখানো হলেও পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি গঠন, জন সংহতি সমিতির সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত করা, যুদ্ধ বিরতিতে সম্মত হওয়া এবং সর্বোপরি বর্তমান সরকারের আমলা-মন্ত্রী থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের অঙ্গীকার ও প্রতিশ্রুতি প্রভৃতি ইতিবাচক উদ্যোগ দেখাতে বাধ্য হচ্ছে। পাশাপাশি যদি নিজেই যুদ্ধবিরতি লংঘন করে থাকে এবং তা যদি বেফাঁস হয়ে পড়ে তাহলে তার ভাওতাবাজী উন্মোচিত হয়ে পড়তে বাধ্য। এজন্য বিভিন্ন হীন কুটকৌশল ও অপপ্রচারণার মাধ্যমে জন সংহতি সমিতির উপর যুদ্ধবিরতি লংঘনের দায় চাপানোর স্বতঃপ্রবৃত্ত তাগিদ সরকারের দেখা দেবে তা নিশ্চিত।

শান্তিবাহিনীরা যদি আক্রমণ করতো তাহলে ঐসব সংঘর্ষ হয় সেনা চলাচলের প্রধান সড়ক বা স্থানসমূহে সংঘটিত হতো নতুবা সেনাবাহিনীর সেক্টর পোষ্ট বা ক্যাম্প আক্রমণ করতো। অথচ সংঘটিত এসব ঘটনা একটিও ঐ ধরণের স্থানে ঘটেনি। সুতরাং শান্তিবাহিনী তথা জন সংহতি সমিতি কর্তৃক এসব যুদ্ধবিরতি লংঘন ঘটেনি, ঘটেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেই। ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে—শান্তিবাহিনীর কার্যকরী সামরিক শক্তিকে দুর্বল করার পাশাপাশি পক্ষান্তরে সরকার তার সামরিক ভীত শক্ত করার কাজেও যুদ্ধবিরতির সুযোগকে সদ্ব্যবহার করছে। যুদ্ধবিরতিকালীন নূতন স্থাপিত সেনা ক্যাম্প-সমূহ থেকেই এর প্রতিফলন ঘটে—

যুদ্ধবিরতিকালীন নূতন স্থাপিত সেনা ক্যাম্পের সংখ্যা

থানার নাম	স্থাপিত সেনা ক্যাম্পের সংখ্যা
নানিয়ার চর	৩ টি
মহালছড়ি	১ টি
বাগড়াছড়ি	১ টি
মেরুং	৩ টি
বাঘাইছড়ি	৩ টি
লক্ষ্মীছড়ি	১ টি
বরকল	১ টি
লংগদু	১ টি
মোট	১৪ টি

জুম্ম সংবাদ বুলেটিন, ২৩শে মে, ১৯৯৩

উপরের পর্যালোচনা থেকে কে যুদ্ধ বিরতি লংঘন করছে এবং তৎপ্রেক্ষিতে সরকারের পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানের সদিচ্ছার আন্তরিকতা অনুমেয়। অপরাপর উদ্যোগের মতো যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হওয়ার পেছনে (১) দেশে-বিদেশে প্রবল জনমত ও চাপকে প্রশমিত করা, (২) পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে সরকারের একটা কৃত্রিম আন্তরিক সদিচ্ছার প্রতিফলন ঘটানো, (৩) পার্বত্য চট্টগ্রামের শান্তিপূর্ণ ও স্বাভাবিক পরিস্থিতি দেখিয়ে ভারতে আশ্রিত জুম্ম শরনার্থীদের ফিরিয়ে আনা, (৪) দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের কাছ থেকে সাহায্যের পথ সুগম করা, (৫) জন সংহতি সমিতির আন্দোলনকে কোণঠাসা করা, (৬) সর্বোপরি Wait and See নীতি অনুসরণ করা ও তার মাধ্যমে নিজের ভিত শক্ত করা প্রভৃতি বহুবিধ উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। তাই বাহ্যত সম্মত হলেও কার্যত: এটি একটি সরকারের কৌশলগত ধাপ্পাবাজী হিসেবে দিন দিন পরিষ্কার হচ্ছে। অধিকন্তু বর্তমান সরকারের সাথে দ্বিতীয় দফা আনুষ্ঠানিক বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেব্রুয়ারীর ১ম সপ্তাহে তৃতীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত না করে দীর্ঘ সাড়ে চার মাস পরে অনুষ্ঠিত করা, শান্তিপূর্ণ অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-শান্তিগ্রাম-বড়গ্রাম ভেঙ্গে দেয়া, ভূমি জরিপ না করা, পর্যায়ক্রমে সেনা বাহিনী প্রত্যাহর করা প্রভৃতি প্রতিশ্রুতি কার্যকরী না করা, সর্বোপরি ভূমি জরিপ ও গণধিকৃত জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার পায়তাঁরা করা, পেশকৃত ৫ (পাঁচ) দফা দাবীনামা অবাস্তব এবং জন সংহতি সমিতির নেতারা উচ্চাভিলাষী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী বলে বক্তব্য রাখা প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহ সরকারের চরম অসদিচ্ছারই প্রতিফলন ঘটায়।

অভিমত | কিছুই দেখি না কিছুই শুনি না কিছুই বুঝি না

আনু মুহাম্মদ

বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জাতির বাইরে যেসব সংখ্যালঘু জাতিসত্তা আছে তাদের সম্পর্কে বাঙালী শিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের নাক উঁচু ভাবটা কোন গোপন ব্যাপার নয়। এক ধরণের দৃষ্টিভঙ্গি হল—এ সব জাতি হচ্ছে বর্বর, এই খায়— সেই খায়, চেহারা কি রকম, কোথায় থাকে গোছের ; আরেকটি দৃষ্টিভঙ্গী হল—বৈচিত্রের জন্য এদের কিছু জিনিস রক্ষা করা দরকার, কিছু মুখস্থ "নাচ-নাচ" "পোশাক" দিয়ে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষন কর, ওরা "উপজাতীয়"—কি-সব ভাষায় কথা বলে বেশ মজার ভাব-ভঙ্গি করে তবে এগুলো ধ্বংস হতে দেয়া ঠিক নয়—এ জাতীয় পিঠ চাপাড়ানো ভাব।

এই দুই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বাঙালী মধ্যবিত্ত বেশ গর্ব অনুভব করে, নিজেকে উঁচু সভ্য জাতির একজন ভেবে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কখনো ধমক দিয়ে কখনো মার দিয়ে কখনও "আদর" করে নিজেদের অবস্থানকে আরও পাকাপোক্ত করতে চায়। শতশত বছর বাঙালী এই দৃষ্টিভঙ্গির শিকার হয়েছে—বিশেষত: ইংরেজ ও ইউরোপীয়দের এই নাক উঁচু ভাব তো লুকানো ব্যাপার ছিল না—গদগদ বাঙালী মধ্যবিত্তের কাঁধে ব্রিটিশ প্রভুর জোয়ালের দাগ এখনও তার খুব প্রিয় স্মৃতি। ইংরেজরা যেভাবে শুধু বাঙালী কেন ভারতীয়দের দেখতো, সেই একই দেখার যোগ্যতা বাঙালী অধিপতিরা অর্জন করতে পেরে মহাগর্বিত। এই যোগ্যতা আর কিছু নয় শাসক শ্রেণীর আসনে যাওয়া। বাঙালী শাসকশ্রেণী আরেকটি জাতির উপর চড়াও হয়ে, তাকে ঘৃণা করে, অসম্মান করে, হত্যা করে, ধর্ষণ করে, ঘর ছাড়া করে, অনুগ্রহ করে খুব গর্ব অনুভব করে।

তাদের উপর চড়াও হয়েছে বাঙালী শাসকশ্রেণী, যাদেরকে সভ্য কোন পূর্ণাঙ্গ জাতি বলেই সে স্বীকার করে না, তাদের কোন জাতীয় উৎসব থাকতে পারে, এটা সে কি করে স্বীকার করবে ? কিন্তু স্বীকৃতি-অস্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবতার কিছু আসে যায় না। বাংলাদেশের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালী জাতি নিজেদের কোন জাতীয় উৎসব

এখনও ঠিক করতে পারেনি, ভাষা আর ধর্মীয় পরিচয়ের দ্বন্দ্বে তাদের পরিচয় সংকট এখনও কাটেনি। কিন্তু সংখ্যালঘু জাতিসত্তাসমূহ তাদের জাতীয় উৎসব সম্পর্কে দ্বিধান্বিত নয়, দ্বিধান্বিত নয় নিজেদের পরিচয় নিয়েও।

পার্বত্য চট্টগ্রামে যে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা বসবাস করেন তাদের মধ্যে তিনটি হচ্ছে চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা। এদের ভাষা, সংস্কৃতি, উৎসব সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না—না জানায় আমাদের কোন লজ্জাও নেই, মাঝে মধ্যে একটু আধটু জেনে ওদের কৃতার্থ করবার ভঙ্গি করি। ওদের আবার উৎসব কি হবে?—এ জন্য জাতীয় বেতার-টিভি ওদের জাতীয় উৎসব সম্পর্কে একটি অনুষ্ঠান তো দূরের কথা একটি ছোট খবরও দেয় না।

বস্তুত: উৎসব করবার মত অবস্থায় ওরা এখন নেই। সারাক্ষণ মৃত্যু, উচ্ছেদ, নিপীড়ন ও ভয়ে ভীত মানুষদের পক্ষে কোন উৎসবের কথা চিন্তা করা মুশকিল। তবু যদি দেখা যায় এই অবস্থা বছরের পর বছর চলছে তাহলে ঐ জনগোষ্ঠীর আর কিছু করবার থাকে না। তখন মৃত্যুর সঙ্গে উৎসবকে এক করে নিতে হয়, সচল জীবন দিয়ে অচল জনপদের প্রতি ব্যঙ্গ ছুঁড়ে দিতে হয়।

এ বছরও তাই উৎসবের প্রস্তুতি চলেছে। উৎসবের নাম বৈসাবি; ত্রিপুরাদের বৈসুক, মারমাদের সাংগ্রাই এবং চাকমাদের বিজু—এক সঙ্গে বৈসাবি। শহুরে বাঙালীরা অভ্যস্ত না হলেও গ্রামাঞ্চলে চৈত্র শেষে এবং বৈশাখের শুরুতে যে উৎসবের আমেজ তৈরী হতো এবং এখনও কিছু কিছু হয় তা চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা জাতি—জাতীয় উৎসব হিসেবেই পালন করে। তাদের এই উৎসব তিনদিনব্যাপী—চৈত্রের শেষ দুদিন এবং ১লা বৈশাখ। চাকমাদের বিজু উৎসবের প্রথম দিন ফুল বিজু দ্বিতীয় দিন মূল বিজু তৃতীয় দিন সামাজিক মিলন। এ সময়ে মেয়েরা ৩০ চৈত্রের ভোরে পাহাড়ী নদীতে ফুল দিয়ে উৎসব শুরু করে। নতুন জামাকাপড় পরে ঘুরে বেড়ায় শিশুরা। স্থানে স্থানে পাহাড়ের ঢালে গান, নাচের অনুষ্ঠান হয়। বাড়িতে বাড়িতে খায় সকলে, নতুন বছরকে স্বাগত জানিয়ে উৎসব শেষ হয়।

এ বছরও সে রকমই পরিকল্পনা হচ্ছিল। তিনদিন সব রক্তচক্ষু ভুলে থাকার প্রস্তুতি। কিন্তু হল না। হৃদয়ের রক্তক্ষরণ নিয়ে যদিও বা উৎসবের আয়োজন করা যায় কিন্তু তাজা রক্তের উপর উৎসব করা যায় না।

উৎসব শুরুর ঠিক এক দিন আগে লোগাং-এ দরিদ্র, বন্দী, নিরস্ত্র শত শত মানুষ নিহত হলেন। শিশু, নারী, বৃদ্ধ। তখন মধ্যাহ্ন। প্রচণ্ড দুপুর। ঘরে ক্লান্ত দুর্বল অসহায় মানুষেরা প্রহর গুণছে। হিংস্র আক্রমণ হল তখনই। খোলা ঘরে কিংবা ঘরে ছিটকিনি দিয়ে আগুন ধরানো হল। আগুন ধরালো যারা, যারা দা, বটি লাঠি ও অন্যান্য অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো তারা সবল; তাদের বরঞ্চ আগুন নেভানোর দায়িত্ব—দুর্বলকে রক্ষা করবার দায়িত্বের কথা বলেই তারা আছে। শত শত ক্ষুদ্র কুটির নিমেষে পুড়ে গেল, পুড়লো মানুষ। নারী-শিশু মাথা হাত পা পোড়া আধপোড়া দেখেছেন অনেকেই।

প্রিয়জন নিহত হলে কি কান্নার অধিকার থাকবে না? চিৎকার করে অভিযোগ জানানোর অধিকার থাকবে না? প্রিয়জন হারানোর বেদনা অন্যকে জানানোর অধিকার থাকবে না? বর্বরদের বিরুদ্ধে পুরো দেশকে জানানোর অধিকার থাকবে না?

না। থাকবে না। কিছুই বলা যাবে না, কাঁদা যাবে না। শিশুদের নিয়ে বাবা হাঁটে, মা মরে গেছে—কোথায় যাবে কি করবে কে জানে? সন্তানেরা হেঁটে বেড়ায় অনিশ্চিত—বাবা-মা দুজনই মরেছে। ..... বর্বর ঘাতক বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায়-তৃপ্তির ছাপ চোখে মুখে। দেশের অখণ্ডতা রক্ষা করলাম। নিহতদের স্বজনেরা পালিয়ে বেড়ায়, একটু বসে কান্নার সাহস নেই। কেউ যেতে পারবে না তাদের কাছে।

তারাই যেতে পারবে পোড়া আধপোড়া জনপদে যারা ফিরে এসে বলবে—"কিছুই হয়নি, জীবনযাত্রা স্বাভাবিক চলছে। ওরা খুব সুখে আছে।"

এই কণ্ঠ আমরা চিনি। এসব বর্বর ঘটনা ও যুক্তির সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় অনেক দিনের। বাঙালী জনগণ শুধু এ তথ্যটুকু জানেন না, তাদের দোহাই দিয়ে তাদের স্বজাতি শাসকেরা একই রকম হায়েনার বর্বর থাবা চাপাচ্ছে অন্য জাতির উপর।

এসব কিছুই ঘটছে, কিন্তু আমরা কিছুই দেখি না, কিছুই শুনি না, কিছুই বুঝি না।

শাসক শ্রেণীর বদৌলতে পত্রিকার পাতায় ও টিভি-বেতারে তৈরী খবর পরিবেশিত হয়, চিন্তা নেই—সব ঠিক-ঠাক। সন্তুষ্ট হবার মত খবর দেখে শুনে বাঙালী শিক্ষিতেরা তৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘুমাতে যায়। বর্ণবাদের শিকার বাঙালী নিজেই বর্ণবাদীতে পরিণত হয়।

পাহাড়ের কোলে কোলে রক্তপাত চলতে থাকে।

১৮-৪-৯২

আবু মুহাম্মদ : প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক। জাহাঙ্গীর-নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সাধারণ সম্পাদক।

[সৌজন্যে : ভোরের কাগজ ২৪/৪/১৯৯২ ইং]

গণআন্দোলন ফোরাম

জেলা পরিষদ প্রহসন চরম সংকটে পর্যবসিত

—শ্রী উদয়ন

জুম্ম জনগণের প্রত্যাখাত খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অযোগ্যতা, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগ এনে সম্প্রতি গণ আন্দোলন ফোরাম নামে এক সংগঠন গঠিত হয়েছে। ঐ ফোরাম গত ৫ই মার্চ আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে (১) সমীরণ দেওয়ানের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, অযোগ্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে অপসারণ, (২) পরবর্তী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তত্ত্বাবধায়ক পরিষদ গঠন ও (৩) সরকার প্রদত্ত সকল প্রকার অনুদান বরাদ্দের (টাকা ও খাদ্যশস্য) ব্যয়ের খাতসহ শ্বেতপত্র প্রকাশ করা—এই তিন দফা দাবী প্রকাশ করে এবং ঐ দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ঘোষণা করে। এতে প্রায় ২৫ কোটি টাকার খাদ্যশস্য থেকে দুর্নীতির কথা বলা হয়েছে।

জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান বা সদস্যদের বিরুদ্ধে এমনতর অভিযোগ বা দাবী নতুন কোন বিষয় নয়। গোড়া থেকেই জুম্ম জনগণ এ পরিষদসমূহকে (খাগড়াছড়ি, রাঙ্গা-মাটি ও বান্দরবন) প্রত্যাখান করে এসেছে। জুম্ম জন-গণের প্রকৃত ও ন্যায্য দাবী সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা ও পদদলিত করে ১৯৮৯ সনে তৎকালীন স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার জোর করে জুম্ম জনগণের উপর এ জেলা পরিষদ চাপিয়ে দিয়েছিল। বর্তমান খালেদা জিয়া সরকার পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সুষ্ঠু ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের কথা বললেও স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের প্রবর্তিত গণ-বিরোধী তিন পার্বত্য পরিষদসমূহকে এখনো বাতিল করা হয়নি। অধিকন্তু এটাকে আরো চুনকাম করার প্রাণপণ অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু সরকার যতই চুনকাম চালিয়ে যাচ্ছে, ততই পরিষদের একের পর এক দেউলিপনার উন্মোচন ঘটে চলেছে।

জেলা পরিষদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধান বিষয়ে গোড়া থেকেই যেমন সন্দেহ-সংশয় ছিল এবং যা দীর্ঘ প্রায় চার বৎসর মেয়াদ কালে প্রামাণিক সত্যে পরিণত হয়েছিল, অনুরূপভাবে সমঝোতা স্মারকে সইদানকারী জুম্ম প্রতিনিধিদের বৈধতা এবং তাদের রাজনৈতিক ভিত্তি, পরিষদের নির্বাচন, তথাকথিত নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সততা ও ভূমিকা প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন মহল থেকে এযাবৎ নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হয়ে আসছে। সমঝোতা

স্মারকের চুক্তি অনুসারে জেলা পরিষদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর, গত '৯১-এর ডিসেম্বরের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর করা না হলে চেয়ারম্যানদের পদত্যাগের হুমকি ও সময় অতিক্রান্ত হওয়া সত্বেও নীরবতা, লোগাং গণহত্যা ও প্রকৃত ঘটনা ধামাচাপা দিতে চেয়ারম্যান-সদস্যদের দালালী, রাঙ্গামাটির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং এরফলে গৌতম দেওয়ানের সুচতুর পদত্যাগ, দিঘীনালার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, জেলা পরিষদ সদস্যদের নজিরবিহীন দুর্নীতি এবং সম্প্রতি দুর্নীতির অভিযোগে সমীরণ দেওয়ানের অপসারণ দাবী করে গণ আন্দোলন ফোরাম গঠন, সর্বোপরি পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশাসনকে বেসামরিকীকরণে চরম ব্যর্থতা প্রভৃতি ঘটনা প্রবাহ ঐ সন্দেহ-সংশয়ের বাস্তব ফলোদয় ঘটেছে।

সম্প্রতি গঠিত গণ আন্দোলন ফোরাম কর্তৃক আনীত অভিযোগের বিরুদ্ধে আহূত পাল্টা এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমীরণ দেওয়ান ঐসব অভিযোগকে সর্বৈব মিথ্যা এবং অভিযোগকারীদের জনসমর্থনহীন ও গণ-বিচ্ছিন্ন বলে উল্লেখ করেছে। সমীরণ দেওয়ান তথা পরিষদসমূহের অপরাপর চেয়ারম্যান-সদস্যদের বিরুদ্ধে অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ এর পূর্বেও বিভিন্ন মহল থেকে অসংখ্যবার উত্থাপিত হয়েছে। প্রতিবারই সমীরণ দেওয়ানরা ঐসব অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা বলে ভেলিকবাজী দেখিয়ে গেছে। কিন্তু এবারকার গণ আন্দোলন ফোরামের অভিযোগ এ কারণে গুরুত্ব বহন করে যে—এই অভিযোগ এসেছে এমন গোষ্ঠী থেকে যে গোষ্ঠীতে খোদ পরিষদের সদস্যও বিজড়িত এবং এটা অভিযোগের সত্যতাকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করে।

গণ আন্দোলন ফোরাম গঠন ও ফোরাম কর্তৃক আনীত অভিযোগ থেকে কয়েকটি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নেয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ গণ আন্দোলন ফোরাম কর্তৃক সাংবাদিক সম্মেলনে বিলিকৃত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে—"বাস্তব ক্ষেত্রে বলতে দ্বিধা নেই, যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং যাদের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা এতে বলা হয়েছে এ পর্যন্ত এই পরিষদ কোন ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পারেনি, পারেনি রক্ত ঝরা বন্ধ করতে, পারেনি সমস্যা সমাধানের নতুন কোন দ্বার উন্মোচন করতে।" সুতরাং এ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে জেলা পরিষদের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান হতে পারে না। জেলা পরিষদের এই রাজনৈতিক সারশূন্যতা ও নির্বীর্যতা খোদ পরিষদের তথাকথিত নির্বাচিত প্রতিনিধি ও তাবেদারদের পক্ষ থেকেই এখন উপলব্ধি এসেছে।

দ্বিতীয়তঃ ঐ প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে—"এমন একজন ব্যক্তি গণতন্ত্রের আবরণে বিগত সরকারের আমলে মনোনীত হয়েছেন যার কোন গণভিত্তি ও রাজনৈতিক চরিত্র নাই।" বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় যে, এখানে 'মনোনীত হয়েছেন' বলা হয়েছে। বস্তুতঃ স্বৈরাচারী এরশাদ সরকার কর্তৃক অনুষ্ঠিত প্রহসনমূলক নির্বাচন জুম্ম জনগণ সম্পূর্ণভাবে বর্জন করেছিল। সরকার সেনাবাহিনী ও অনুপ্রবেশকারীদের দিয়ে ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ব-নির্ধারিত ব্যক্তিদের মনোনীত করেছিল। এসব লোকদের কোন গণভিত্তি যেমন নেই, রাজনৈতিক চরিত্রও বিন্দুমাত্র নেই। জনমতকে বিভ্রান্ত করার লক্ষ্যে কতিপয় দালাল তাবেদার লেজুড় সুবিধাবাদী সর্বোপরি ভুঁইফোড় রাজনীতিকদের হালুয়া-রুটির লোভ দেখিয়ে তথাকথিত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর আদায় করে নেয়া হয় ও পরিষদে মনোনীত করা হয়।

সুতরাং এরা ঘোষিত-অঘোষিত 'যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং যাদের স্বার্থ সংরক্ষণের' জন্য এ পরিষদ গঠন করা হয়েছিল সে লক্ষ্যে কাজ করা বা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা সমাধানে ইতিবাচক উদ্যোগ রাখার চাইতে অর্থ আত্মসাৎ অর্থাৎ দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার দিকে যে বেশী ঝুঁকবে এবং জেলা পরিষদ দুর্নীতিবাজ ও সুবিধাবাদীদের আখড়ায় পরিণত হবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর জাল করে ভুঁয়া প্রকল্পের অনুকূলে ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের প্রায় ১২২ মেট্রিক টন খাদ্যশষ্য আত্মসাৎ করতে গিয়ে আবদুল মান্নান নামে পরিষদের অপর এক সদস্যও সম্প্রতি এরূপ একটি দুর্নীতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে বলে জানা গেছে (সূত্র: —সাপ্তাহিক পার্বতী, ১৯ মার্চ ১৯৯৩)। তাদের এ লুটতরাজকে নিরাপদ করতে এরা কখনো পদত্যাগ করে, কখনো পদত্যাগের হুমকি দিয়ে, কখনো বড় বড় রাজনৈতিক

বুলি আওড়িয়ে, কখনো বা একের বিরুদ্ধে আরেক-জন মামুলি দুর্নীতির অভিযোগ এনে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে। এমনকি সময়ে সময়ে ক্ষমতাসীন দলে বরাবরের মতো যোগ দিতেও এরা ভুল করে না।

তৃতীয়তঃ এ ফোরামে জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন রাজ-নৈতি দলের লোকদের সমাবেশ ঘটেছে—যা বেশীর ভাগই অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালী। প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষরদাতাকারী ১৪ জনের মধ্যে ১০ জনই অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালী মুসলমান। বাঙ্গালীদের সোচ্চার হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো—জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান পদটি বাঙ্গালীদের জন্য উন্মুক্ত করা। বাঙ্গালীরা গোড়া থেকেই ঐ দাবী করে আসছে। সমীরণ দেওয়ানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি, অযোগ্যতা, স্বজনপ্রীতি ও স্বেচ্চাচারিতার অভিযোগ এনে অনুপ্রবেশকারী বাঙ্গালীরা প্রকারান্তরে ঐ দাবীকে জোরালো করা বা বৈধতা দানের ক্ষেত্র তৈরীর কাজে সদ্ব্যবহার করবে এটা বলা যায়।

এটাই আজ প্রমাণিত হয়েছে যে—জেলা পরিষদ প্রহসন তথা পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যা নিয়ে বাংলাদেশ সরকার আজ চরম সংকটে নিমজ্জিত। এ সমস্যাকে একটা ফলপ্রসূ সমাধান দানের জন্য দেশে-বিদেশে আজ সরকার প্রবল চাপের মধ্যে রয়েছে। এ সংকট উত্তরণের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক কমিটি গঠন ও জন সংহতি সমিতির সাথে লোক দেখানো বৈঠক করতে বাধ্য হচ্ছে। পাশাপাশি সুবিধাবাদী দুলাদের প্রয়োজন মুহূর্তে দাবার গুটি হিসেবে সদ্ব্যবহার করার লক্ষ্যে হাতের কাছে রাখতে ও অধিকন্তু লুটতরাজের সুযোগ দিতে বাধ্য হচ্ছে। তাদের এই লুটতরাজ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যেখানে লুটতরাজের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে এখন তাদের মধ্যে চলছে পারস্পরিক সংঘাত ও বচসা। এই বচসা ও সংঘাত থেকেই আজ গণ আন্দোলন ফোরাম গঠন, পরস্পরের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগ, পরস্পরকে জনসমর্থনহীন ও গণ-বিচ্ছিন্ন বলে অখ্যায়িত করে সংগোপনে নিজের স্বরূপ বেফাঁস করা প্রভৃতি ঘটনাপ্রবাহের উন্মেষ ঘটছে। কাজেই সরকার যতই এরূপ ষড়যন্ত্রমূলক পদক্ষেপ হাতে নেবে ততই এভাবে সংকটের বেড়াজালে আরো গভীরভাবে জড়িয়ে পড়বে এবং ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে অনিবার্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

সংবাদ

আমেরিকান রাষ্ট্রদূতের লোগাং সফর

পার্বত্য চট্টগ্রামের বেসামরিক জুম্ম জনগণের উপর বাংলাদেশ সরকারের দমন পীড়নের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসনাল হিউম্যান রাইটস্ ককাস-এর চেয়ারম্যান মিঃ টম লেনটোস গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। ১০ই এপ্রিল, ১৯৯২ ইং লোগাং-এর লোমহর্ষক গণহত্যা ও এ গণহত্যা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন কর্তৃক পেশকৃত প্রহসনমূলক তদন্ত রিপোর্টে উদ্বিগ্ন হয়ে তিনি গত ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৯২ ইং ঢাকাস্থ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মিঃ উইলিয়াম বি মিলামকে উক্ত ঘটনা তদন্তের নির্দেশ প্রদান করে এক চিঠি লিখেন এবং উক্ত লোমহর্ষক ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তিনি চিঠিতে উল্লেখ করেন। সেই অনুসারে গত ৪ঠা এপ্রিল উক্ত রাষ্ট্রদূত ক্ষত বিক্ষত লোগাং গুচ্ছগ্রাম পরিদর্শনে আসেন। হাজার হাজার জুম্ম নর-নারী ও শিশু তাঁকে প্রাণঢালা সম্বর্ধনা জানায়।

তিনি উপস্থিত জনতার বিভিন্ন জনের কাছে ঘটনার উৎপত্তি, এর প্রকৃত কারণ, বিস্তৃতি, এর জন্য কারা দায়ী, এতে শিরাপত্তা বাহিনীর ভূমিকা কি ছিল ইত্যাদি বিষয়ে জানতে চাইলে তারা প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিতে সক্ষম হন। এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশনের তদন্ত রিপোর্ট সম্পর্কে জানতে চাইলে জনতা ঐ রিপোর্টকে সেনাবাহিনীর বয়ান হিসাবে উল্লেখ করেন। উপস্থিত জনতার কাছে প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে অনুধাবন করতে পেরে রাষ্ট্রদূত এ সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সাথে আলাপ করবেন বলে আশ্বাস দেন এবং ঘটনার পুনঃ তদন্তসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরাজমান সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করা হবে বলেও তিনি আশ্বাস দেন। রাষ্ট্রদূতের এ আশ্বাসের জন্য জনতা তাঁকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টনের নিকট লেখা একখানা স্মারকলিপিও তাঁর হাতে তুলে দেন।

লোগাং গুচ্ছগ্রামে শোকসভা

গত বছরের ১০ই এপ্রিল জুম্মজাতির ইতিহাসের বর্বরতম লোগাং গুচ্ছগ্রাম গণহত্যা এক বছরে পা দিলো। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণ এ বীভৎসতাকে কিছুতেই ভুলতে পারে নি। তাই এ গণহত্যায় নিহত শত শত নর-নারী ও শিশুর আত্মার শ্রদ্ধা জানাতে গত ১০ই এপ্রিল, স্থানীয় জুম্ম বুদ্ধিজীবি, ছাত্র সমাজ ও সাধারণ মানুষ অকুস্থলে এক শোকসভার আয়োজন করেন। ঐ দিন সকাল থেকে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার ব্যাথাহত জুম্ম নর-নারী, শিশু, ছাত্রছাত্রী, বুদ্ধিজীবি জনতা শোভাযাত্রার মাধ্যমে অকুস্থলের উদ্দেশ্যে রওনা দেন এবং সকাল আনুমানিক ১০টায় ক্ষত বিক্ষত পোড়াগ্রামে মিলিত হন। ঘটনাস্থলের ঠিক কেন্দ্র বিন্দুতে পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের ঢাকা মহানগরী শাখার সাধারণ সম্পাদক ভুবন ত্রিপুরার পুষ্প মাল্য অর্পণের মধ্য দিয়ে নিহত জুম্মদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন শুরু হয়। পুষ্পমাল্য অর্পণ সমাপ্তির পর পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের পানছড়ি শাখার সভাপতি কুসুমপ্রিয় চাকমার সভাপতিত্বে শোকসভা শুরু হয়। পাহাড়ী ছাত্র পরিষদের হিমাংশু বিকাশ চাকমার উদ্বোধনী ভাষণের পর কেন্দ্রীয় কমিটির সহ-সম্পাদক মিন্টু বিকাশ চাকমাসহ আরো অনেকে বক্তৃতা করেন। সকল বক্তাই নিহত জুম্মদের আত্মীয় স্বজনদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করার পর এই জঘণ্যতম গণহত্যাকে ধিক্কার জানান এবং ভবিষ্যতে যে কোন ধরণের জুম্ম বিদ্বেষী সরকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে প্রস্তুত থাকার জন্য আপামর জুম্ম জনগণের প্রতি আহবান জানান। উক্ত শোকসভা বিকাল ২টা পর্যন্ত চলে। সন্ধ্যা নেমে আসতে না আসতে শহীদদের স্মরণে প্রদীপ জ্বালানোর উদ্দেশ্যে অগণিত জুম্ম নর-নারী সমবেত হন লোগাং বন বিহারে। হাজার বাতি জ্বালানো ও আকাশে ফানুস উড়ানোর মধ্য দিয়ে শহীদদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ঐ দিনের সমাপ্তি ঘটে।

সেনবাহিনীর যুদ্ধ বিরতি লংঘন

বিগত ২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৯২ জন সংহতি সমিতি ও সরকারী কমিটির মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উভয় পক্ষই ৩১ মার্চ, ১৯৯৩ইং পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি পালনে সম্মত হন। জন সংহতি সমিতির সশস্ত্র অঙ্গ-সংগঠন শান্তি বাহিনী যুদ্ধ বিরতির নিয়ম নীতি মেনে চললেও ঘর-পাকড়, লুঠপাট, অপারেশন, এ্যামবুশ, ধর্ষণ, চলাচলে নিয়ন্ত্রণ, সভা-সমিতির উপর বিধিনিষেধ প্রভৃতির মাধ্যমে সেনাবাহিনী যুদ্ধ বিরতির নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করে চলেছে। যেমন—গত ৯ইমার্চ মাটিরাঙ্গা জোনের বালাছড়ি ক্যাম্পের সুবেদার ওয়ালিখান কর্তৃক শ্রীমতি গাইধুমা মারমা, ওয়াগুপাড়া বাল্যাছড়ি, মাটিরাঙ্গাকে ধর্ষণ, ১০ মার্চ এ্যামবুশের মাধ্যমে ক্যাইনদ্যা ক্যাম্প সেনাদের (৪৫ ইবিআর) শান্তি বাহিনীর ৩ সদস্যকে গ্রেপ্তার, ১৪ই মার্চ পুজগাং বনভোজন অনুষ্ঠান থেকে পানছড়ি জোনের সেনাদের বিনা কারণে ৩ জুন জুম্ম ছাত্রকে গ্রেপ্তার, ২৩ মার্চ কতিপয় জুম্মর উপর পুজগাং ক্যাম্পের সেনাদের (৩৩ ইবিআর) এলোপাতাড়ি গুলিবর্ষণ প্রভৃতি সেনাবাহিনীর যুদ্ধ বিরতি নিয়ম-নীতি লংঘনের দৃষ্টান্ত বহন করে।

খাগড়াছড়িতে বৈ-সা-বি সভা

১২ই এপ্রিল, ১৯৯৩ইং বাংলা পুরাতন বর্ষকে বিদায় ও নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে খাগড়াছড়িতে বৈ-সা-বি উদ্‌-যাপন কমিটি কর্তৃক এক সভার আয়োজন করা হয়েছে। সভার আহবায়ক ছিলেন পাহাড়ী গণ পরিষদের খাগড়াছড়ি শাখার সভাপতি সৌখিন চাকমা এবং শ্রী অনন্ত বিহারী খীসা, প্রধান শিক্ষক, রামগড় সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন।

যদিও বৈ-সা-বি জুম্ম সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব কিন্তু শাশ্বতকালের উদযাপন ধারার সাথে এ বছরের বৈ-সা-বি জুম্ম জনগণের কাছে তেমন আনন্দঘন ছিলনা। কারণ, গত বছরে এ উৎসবের প্রাককালেই লোগাং গুচ্ছগ্রামে নিরাপত্তা বাহিনীর ছত্রছায়ায় অনুপ্রবেশকারী মুসলমান বাঙ্গালীরা সংঘটিত করেছিল এক নরকীয় গণহত্যা। তারই বিষাদঘন স্মৃতিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়েই জুম্ম জনগণ সমবেত

হয়েছিল এবারের বৈ-সা-বি উৎসবে।

গত বছরের ন্যায় এ বছরেরও বৈ-সা-বি উৎযাপন কমিটি কর্তৃক নিমন্ত্রিত হয়ে ঢাকা থেকে কতিপয় রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্রনেতা, আইনজীবী খাগড়াছড়িতে এসেছিলেন বৈ-সা-বিতে যোগ দিতে। নিমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের মধ্যে ছিলেন... ... (১) জনাব জলীল ভুঁইয়া, ডেলি স্টার, (২) বেগম আইনুন হাসান, প্রভাষক জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, (৩) বেগম মোশারোফা মিশু, সভানেত্রী বাংলাদেশ ছাত্র ঐক্য ফোরাম, (৪) জনাব মাহমুদ হাসান (জুলু) সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ঐক্য ফোরাম, (৫) মহিউদ্দীন হাসান চৌধুরী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি, (৬) জনাব মোস্তফা ফারুক, বাসদ, ঢাকা নগর কমিটি, (৭) শরীফ নুরুল আল-আমিন বাসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি (৮) ব্যারিস্টার লুৎফর রহমান, মানবাধিকার কর্মী প্রমুখ। আয়োজিত সভায় অতিথিবৃন্দ বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে ঐতিহ্যবাহী উৎসবের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য বৈ-সা-বি উদ্‌যাপন কমিটি তথা জুম্ম জনগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

বৈ-সা-বি উৎসব যদিও জুম্মদের নিকট সবচেয়ে বড় উৎসব, যেখানে প্রত্যেকটি জুম্ম নর-নারীর চোখে মুখে উৎফুল্লতার ছাপ থাকার কথা, কিন্তু এবারের বৈ-সা-বিতে প্রত্যেকের চোখে মুখে ভয় ভীতি ও বিষাদের ছাপ পরিলক্ষিত বলে অতিথিবৃন্দ বক্তৃতা দানকালে মন্তব্য করেন। পার্বত্য চট্টগ্রামের অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ও গত বছরের লোগাং হত্যাকাণ্ডের নারকীয় স্মৃতিতেই আজ এ মহান উৎসবের দিনেও জুম্ম নর-নারীর চোখে মুখে এ বিষাদের ছায়া বলে অতিথিবৃন্দ উল্লেখ করেন।

ঢাকা থেকে আগত অতিথিবৃন্দ বক্তব্যচ্ছলে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকারও পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারের সামরিক কায়দায় জুম্ম জনগণের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন অব্যাহত রাখার জন্য এবং একই কায়দায় অত্রাঞ্চলের বিরাজিত সমস্যার সমাধানে পদক্ষেপ নেয়ার জন্য তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। আরো ক্ষোভ প্রকাশ করেন একথা বলে যে, স্বৈরাচারী এরশাদ সরকারকে পতন ঘটিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যাবস্থায় দাবীতে স্বয়ং গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শরীক হয়ে গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াও পার্বত্য চট্টগ্রামে স্বৈরাচারী সরকারের কায়দায় অত্রাঞ্চলের বিরাজিত সমস্যাকে জিইয়ে রেখেছেন। বক্তারা সবাই অচিরেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতির অবসান করে সমস্যার স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধানের পদক্ষেপ নিতে খালেদা জিয়া সরকারের কাছে আহ্বান জানান। সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সরকার ও জনসংহতি সমিতির মধ্যে যে সংলাপ শুরু হয়েছে, তাকে তারা স্বাগত জানিয়ে সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত সংলাপ যেন বানচাল না হয়, তার জন্য উভয় পক্ষের কাছে আহ্বান জানান।

গত বছরের লোগাং গণহত্যা পূর্ববর্তী স্বৈরাচারী সরকারের সকল প্রকার নির্যাতনকেও হার মানিয়েছে বলে অতিথিবৃন্দ উল্লেখ করেন। এ ঘটনার দায় দায়িত্ব শান্তিবাহিনীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া সরকারের অপপ্রচারণাকে তারা ধিক্কার জানান এবং এ ধরণের ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন আর না ঘটে তার জন্য ক্ষমতাসীন সরকারের কাছে আহ্বান রাখেন। উক্ত ঘটনার জন্য বিচারপতি সুলতান হোসেন খানকে নিয়ে গঠিত এক সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিশনের রিপোর্টকে কটাক্ষ করে বাংলাদেশ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের জনাব মোস্তফা ফারুক এ রিপোর্টকে প্রহসন বলে উল্লেখ করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামের এ ধরণের লোমহর্ষক ঘটনা বন্ধ করা সহ অত্রাঞ্চলের বিরাজিত সমস্যার স্থায়ী সমাধান তথা জুম্মদের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য, ধর্ম, সংস্কৃতি ভূমি অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে পাহাড়ী ছাত্র-ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী তথা সর্বস্তরের জুম্ম জনগণকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে অতিথিগণ আহ্বান জানান। জুম্ম জনগণের এ ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে তারা সর্বাত্মক সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন।